আবে জমজম

জমজম পানির উৎসটি বিশ্বের এক চিরকালীন বিস্ময়। প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে এটি মানব জাতির কাছে আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করছে। খানায়ে কাবার কাছে (হজরে আসওয়াদের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে) অবস্থিত বেহেশতি পানির এই উৎসটির কয়েকটি অসাধারণ দিক হলো : ১) প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে আবিস্কৃত হওয়ার পর থেকে সব সময়েই (মাঝে জাহেলিয়াতের যুগের কিছু সময় বাদ দিয়ে) তার পানির উচ্চতা একই অবস্থানে বিদ্যমান রয়েছে। কোনো পরিস্থিতিতেই তার পানি কমেনি। ২) কখনোই পানির উৎস নিয়ে সঙ্কট সৃষ্টি হয়নি। ৩) জমজমের পানি যত খুশি পান করা যাবে, কিন্তু তবুও সেই পানির কোনো ঘাটতি হবে না।

জমজম কূপটি আবিস্কারের সাথে মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহিম (আ.) এবং তার পরিবারের স্মৃতি জড়িত রয়েছে। হযরত ইবরাহিমের (আ.) দুই স্ত্রী ছিলেন- হযরত সারাহ ও হযরত হাজেরা।

হযরত ইবরাহিম (আঃ) ৮৬ বছর বয়সে দ্বিতীয় স্ত্রীর মাধ্যমে প্রথম পুত্র সন্তান হযরত ইসমাইলকে (আ.) লাভ করেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত ইবরাহিমকে (আ.) তার প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত বিবি হাজেরা এবং দুগ্ধপোষ্য পুত্র হযরত ইসমাইলকে (আ.) জনমানবশূন্য বিরান ও শুস্ক মরুভূমি মক্কায় রেখে আসার নির্দেশ দেন। হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর এই নির্দেশ মেনে নিয়ে মাত্র এক ব্যাগ খেজুর এবং এক মশক ভর্তি পানিসহ তাদের সেখানে রেখে আসেন।

আল্লাহর এই নির্দেশ বিবি হাজেরাও মেনে নিলেন। আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি শিশুপুত্রকে নিয়ে একাকী সেই নির্জন মরুতে থেকে গেলেন। স্ত্রী-পুত্রকে মরুভূমিতে রেখে যাওয়ার সময় হযরত ইবরাহিম (আ.) বিশেষ করে পানির জন্য দোয়া করলেন। তার দোয়া কবুল হয়েছিল।

হযরত ইবরাহিমের (আ.) রেখে যাওয়া খেজুর ও পানি শেষ হয়ে যাওয়ায় হযরত হাজেরা পাগলপ্রায় হয়ে যান। বিশেষ করে শিশুপুত্র হযরত ইসমাইলের জীবন বাঁচানোর চিন্তায় তিনি কাতর হয়ে পড়েন। পানি ও মাতৃদুগ্ধের অভাবে তিনি মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন। তাই পানির সন্ধানে ছেলেকে রেখে বিবি হাজেরা কাছে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে ছুটাছুটি করতে থাকলেন। তিনি সম্ভবত দেখতে চাচ্ছিলেন, আশে পাশে কোনো কাফেলার দেখা পাওয়া যায় কিনা, যাদের কাছ থেকে খাবার, পানি নেওয়া যায়। তার সেদিনের এই ছোটাছুটিকে স্মরণ রাখার জন্য এখনো ওমরাহ ও হজ্জের সময় ওই পাহাড় দুটি সায়ী করা হাজিদের জন্য বাধ্যতামূলক। সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুটিতে সাতবার দৌড়াদৌড়ি শেষে হতাশ হয়ে তিনি ছেলের কাছে ফিরে আসেন। সেখানে তার জন্য এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তিনি দেখলেন, হযরত ইসমাইলের পায়ের কাছে পানির এক চমৎকার উৎস সৃষ্টি হয়েছে। হযরত ইসমাইলের (আ.) পায়ের আঘাতে কিংবা হযরত জিব্রাইলের (আ.) ডানার ঝাপটায় এই উৎসের সৃষ্টি হয়েছে। এই পানি দেখে তিনি খুব খুব খুবই খুশি হলেন। তিনি ও হযরত ইসমাইল (আ.) সেই পানি পান করে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন। তারা বেঁচে থাকার অবলম্বন পেলেন।

বলা হয়ে থাকে, হযরত হাজেরা জমজমের উৎসের চারদিকে বালির দেওয়াল তোলায় তা সেখানেই কেন্দ্রীভূত এবং নিয়ন্ত্রিত থাকে। তিনি এসময় বলছিলেন 'জমজম (থামো বা এখানেই থাকো)'। এ কাজ করা না-হলে এই পানি কত দূর ছড়িয়ে পড়তো, আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। সেই থেকে কূপটির নামও হয় জমজম।

মক্কায় জমজম কূপ আবিস্কারের পর স্থানটি দ্রুত আকর্ষণীয় এলাকায় পরিণত হলো। আশপাশের লোকজন সেখানে সমবেত হতে লাগলো। একটি সভ্যতার সূচনার পরিবেশ সৃষ্টি হলো।

ইয়েমেন থেকে আসা 'জারহাম' গোত্র বিবি হাজেরার কাছে মক্কায় ফসল ফলানো এবং তা ভাগাভাগি করে নেওয়ার একটি প্রস্তাব করল। তারা সমঝোতায় পৌঁছল। তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেছিল, কাবা ঘরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও পেয়েছিল।

পরে তারা পুরোপুরি অনাচার ও অবিচারে নিমজ্জিত হলো। পরিণতিতে জমজমের পানি শুকিয়ে গেল। অন্য একটি ভাষ্যে দেখা যায়, জারহাম গোত্র যখন আল্লাহ দেয়া সীমারেখা অতিক্রম করেছিল, তখন কিনা ও খাইজা নামে দুটি গোত্র তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। প্রচ- লড়াইর পর জারহাম গোত্র হেরে যায়। তবে তারা বিতারিত হওয়ার আগে বড় বড় পাথর এবং অন্যান্য সামগ্রী জমজমের উৎসে ফেলে দিয়ে তা ভরাট করে ফেলে। তারা এমন নিখুঁতভাবে এই কাজটি করেছিল যে জমজমের উৎস একেবারে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেল।
বলা হয়ে থাকে হযরত ইসমাইল (আ.) জারহাম গোত্রে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু তার ইন্তেকালের পর তারাই খানায়ে কাবা এবং জমজমের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসে। এই ঐশ্বর্যই তাদের পতন ত্বরান্বিত করে। এই প্রেক্ষাপটেই কিনা এবং খাইজা গোত্র তাদের উপর আক্রমণ চালায়। তবে আরেকটি ভাষ্যে দেখা যায়, বিবাহের পর ইসমাইল (আ.) নিজেই কূপটি ভরাট করে মক্কা ত্যাগ করেন।

এর পর দীর্ঘ সময় জমজম উৎস সবার অগোচরে থাকে। মহানবির (সা) জন্মের পর তার দাদা কোরাইশ নেতা আব্দুল মোতালেব আবার খননকাজ চালান। সুরা ফিলে বর্ণিত আবরাহার হস্তি বাহিনীর আক্রমণের ঘটনার পর তিনি ক্রমশ ধনী ব্যক্তিত্বে পরিণত হচ্ছিলেন। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখলেন, মানব কল্যাণে আল্লাহ তাকে জমজম খনন করার আদেশ দিচ্ছেন। প্রথমে তিনি সঠিক জায়গায় খনন কাজ চালাতে পারেননি। আরেক দিন স্বপ্নে তিনি সঠিক জায়গাটির হদিস পান। সেই অনুযায়ী আব্দুল মোতালেব তার তখন পর্যন্ত একমাত্র ছেলে হারিসকে নিয়ে জমজম খনন করতে থাকেন। তাদের কয়েক দিনের প্রয়াসের ফলে আবার জমজমের পানি বের হয়ে আসে। মোতালেবের মোট ১০ ছেলে ছিল। তবে জমজম আবিস্কারের পর বাকি ৯ ছেলে জন্মগ্রহণ করে। সেই থেকে সাড়ে ১৪ শত বছর ধরে সেই একই স্থানে বহাল রয়েছে আবে জমজম।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি ক্যামিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তারিক হোসাইন জমজম কূপে গবেষণা চালনা করেন। তাতে দেখা যায়, কূপটির আয়তন হচ্ছে: ১৮ ফুট বাই ১২ ফুট বাই ৫ ফুট। তিনি জমজমের পানির নমুনার ক্যামিক্যাল এবং বায়োলজিক্যাল পরীক্ষাও করেন। এর আগে মিসরীয় জনৈক চিকিৎসক বলেছিলেন, মক্কার পয়োঃনিস্কাশনের পানিই জমা হয় জমজমে। কিন্তু তারিক হোসেনের গবেষণায় তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। মক্কা নগরীটি শক্ত, গ্রানাইট পাথরের পার্বত্য উপত্যকায় অবস্থিত। হারাম শরিফটি (মসজিদুল হারাম) উপত্যকার সর্বনিম্ন অবস্থানে। স্থানটিতে ৫০ থেকে ১০০ ফুট গভীর আগ্নেয়শিলার আবরণ রয়েছে। জমজম কূপটি এমন একটি জায়গায় অবস্থিত এবং এর পানির উচ্চতা প্রাকৃতিক ভূমিস্তরের ৪০ থেকে ৫০ ফুট নিচে। এই পানি কখনো বন্ধ হবার নয়।
১৯৬৮ সালে একবার মক্কায় বন্যা দেখা গিয়েছিল। পানি ৭ ফুট উঁচুতে উঠেছিল। জমজম কূপেও ঢুকেছিল বন্যার পানি। তাই বন্যার পর নোংরা পানি জমজম থেকে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। অত্যন্ত শক্তিশালী কয়েকটি মোটর পাম্প লাগানো হয়। মনে করা হয়েছিল পাম্প দিয়ে জমজমের সব পানি দ্রুত সরিয়ে নিলে পরে বিশুদ্ধ পানিই আসবে সেখানে। কিন্তু কয়েক ঘন্টা পানি উত্তোলনের পর জমজমের পানি কমার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তাই সেই চেষ্টা বাদ দেওয়া হলো।
জমজমের পানির উৎস তিনটি বলে ধারণা করা হয়:
১) কাবা ঘরের নিচ থেকে রুখনে বা হাজরে আসওয়াদ হয়ে জমজম পয়েন্টে।
২) সাফা পাহাড়ের নিচ থেকে জমজম পয়েন্টে।
৩) মারওয়ার নিচ থেকে জমজম পয়েন্টে।

জমজমের মুখ থেকে ৪০ হাত পর্যন্ত প্লাস্টার করা। তার নিচে পাথর কাটা অংশ আরো ২৯ হাত। এসব লাল পাথরের ফাঁক দিয়েই তিনটি প্রবাহ থেকে আসে পানি।

জমজমের পানি অত্যন্ত পবিত্র এবং পৃথিবীর কোনো পানির সাথে তার তুলনা হয় না। অত্যন্ত স্বচ্ছ এই পানিতে বিন্দুমাত্র দূষণ দেখা যায় না। রোগ জীবাণু কিংবা কাদামাটি বা আবর্জনাও দেখা যায় না। জমজমের পানিকে কেবল বেহেশতের আবে কাউসারের সাথে তুলনা করা যায়। এই বিশুদ্ধ পানি অত্যন্ত রুচিকর। উচ্চ মাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ এই পানি খেয়েই জীবনধারণ করা যায়। হযরত আবু জর গিফারি (রা.) একবার টানা ৩০ দিন এই পানি পান করে জীবনধারণ করেছিলেন। মহানবি (সা.) এবং সাহাবাদের স্মৃতিধন্য এই পানির প্রতি সব মুসলমানের অকৃত্রিম আকর্ষণ রয়েছে। হজ বা ওমরাহ কিংবা অন্য যেকোনো প্রয়োজনে কেউ মক্কায় যাবে, অথচ জমজমের পানি পান করবে না, কেউ তা কল্পনাও করতে পারে না। তারা নিজেরা তো এই পানি পান করেনই, আর সাথে করে পর্যাপ্ত পানি নিয়ে যান আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশিদের জন্য। মাসের পর মাস বছরের পর বছর জমজমের পানি নানাভাবে দূর দুরান্তে মুসল্লিরা নিয়ে যাচ্ছে। কোনো সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছাড়াই এই পানি মাসের পর মাস স্বাদে, গন্ধে ও বর্ণে অটুট থাকছে। পৃথিবীর দূরতম প্রান্তেও এই পানি পৌঁছে যাচ্ছে বিশুদ্ধ অবস্থায়। বর্তমানে সৌদি সরকার এই পানি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মক্কাতেও আরো কয়েকটি কূপ আছে। কিন্তু তার কোনোটিই জমজমের মতো নয়। তেমন বেশি পানিও সরবরাহ করতে পারে না সেগুলো। এমনকি পৃথিবীর অন্য সব জায়গায় সেসব কূপ আছে সেগুলোও কয়েক বছর পর শেওলা জমে যায়, পানির স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। একপর্যায়ে সেগুলো আর ব্যবহারের উপযোগী থাকে না। অথচ জমজমে প্রতিনিয়ত পানি থাকছে। হজের সময় প্রায় লাখ লাখ হাজির পানির যোগান দিয়ে যায় এই জমজম। কখনো তার পানিতে কোনো ধরনের পরিবর্তন হয়নি।

বিভিন্ন উৎস থেকে ধারণা করা হয়ে থাকে জমজমের উৎস হয়েছিল এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। এই হিসাবের ভিত্তি হলো- হযরত ইবরাহিম (আ.) ও হযরত মুসার (আ.) মধ্যকার সময়ের পার্থক্য ১,০০০ বছর। হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ঈসার (আ.) সময়ের পার্থক্য ১,৯০০ বছর । আবার হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মোহাম্মাদের (সা.) পার্থক্য ৫৬৯ বছর। তাই বলা যায় হযরত ইবরাহিম (আ.) ও হযরত মোহাম্মাদের (সা.) মধ্যকার সময় হচ্ছে ৩,৪৬৯ বছর।

কেউ যদি আল্লাহর কুদরত দেখতে চায়, তাদের জন্য একটি কুদরত হতে পারে এই জমজম কূপ।

- See more at: http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/55337#sthash.I9Wb1kLe.dpuf